Volume -1, Issue-1, 2019
pp 36-47

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ : কবির আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দ

শংকর কুমার মল্লিক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : mallickkhluna@gmail.com

রবীন্দ্রকাব্যে অসীমের আহ্বান, বিশ্ববোধ, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে নিগূঢ় রহস্য-চেতনা, মানবমহিমার জয়গান, সার্বজনীন ভাব ও আদর্শপ্রীতি, অপার্থিব প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এর উদ্ভব হয়েছে এক অতীন্দ্রিয় ও অধ্যাত্ম অনুভূতি থেকে। কাব্যচর্চার শুরুতেই কবির এই বোধের জন্ম হয়নি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কবির অন্তরের গভীরে এই বিশ্ববোধের জাগরণ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তার অস্তিত্ব অনুভব করছিলেন, কিন্তু কবিতার ভাষায় তা প্রস্ফুটিত হচ্ছিল না। এক পুণ্য প্রভাতে নব অরুণোদয়ের আলোক রাশিতে কবির অন্তর্গত সেই বন্ধন উন্মোচিত হলো। তিনি প্রতিদিনের চারপাশের প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্ব মানবাত্মার সন্ধান পেলেন। এক অভূতপূর্ব আনন্দে তিনি উদ্বেলিত হয়েছিলেন। উপলব্ধি করলেন আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ হতেই বিশ্বসৃষ্টি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতে যা কিছু প্রকাশিত, তাই-ই আনন্দের অমৃতরূপ। এই আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দে রবীন্দ্রনাথ জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই উপলব্ধিতার বেদীমূলে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৌধ।

প্রায় সাড়ে ছয় দশক ধরে রবীন্দ্রনাথ কাব্য, সংগীত, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কথিকা, ধর্মতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি রচনা করেছেন। আশি বছরের জীবনকালে ব্যক্তিগত জীবনযাপন, কাজকর্ম, সারা পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ, অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের গোড়াপত্তন ও তার পরিচালনা, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনাসহ বহুবিধ কাজের পাশাপাশি তিনি এই বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। ভাষার অপূর্ব কারুকাজে, ভাবের বিচিত্র লীলায়, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের অপরূপ বিলাসে অধ্যাত্ম-অনুভূতির কাব্য রূপায়ণে রবীন্দ্র-সাহিত্য সহৃদয় হৃদয় সংবাদী পাঠককে সবিস্ময়ে মুগ্ধ করে প্রতিমুহূর্তে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমত কবি, প্রধানত কবি এবং শেষ বিচারেও তিনি কবি। সাহিত্যিক-জীবনারম্ভের একেবারে প্রাথমিক পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের অনুকরণ করেই চলেছিলেন। কিন্তু খুব দ্রুত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কাব্য রচনার এ পথ তাঁর নয়। তারপর সন্ধ্যা সংগীতের যুগ হতেই তিনি তাঁর নিজস্ব গতিপথ আবিষ্কার করেন। এরপর থেকে তিনি দীর্ঘ কবিজীবনে নানাভাবে একান্ত অন্তর্মুখী কবিচিত্তের ভাষানুভূতি গীতিকাব্যে প্রকাশ করেন। 'সন্ধ্যাসংগীতের' পরে প্রকাশিত 'প্রভাতসংগীতে'র 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনার মধ্যদিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরাত্মাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার নিদ্রাভঙ্গ।[১]

রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি ১২৮৯ বঙ্গাব্দে রচিত হয়। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন এটি ১২৮৯ সনের আশ্বিন মাসে রচিত।[২] কিন্তু রবি জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল কবির সদর স্ট্রীটের বাড়িতে অবস্থান-কাল বিবেচনা করে এটি ঐ বৎসরের প্রথম দিকে লেখা বলে মত দিয়েছেন।[৩] 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি কলিকাতার ১০নং সদর স্ট্রীটের বাড়িতে বসে লেখা একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন।[৪] কলকাতা শহরের চৌরঙ্গির ভারতীয় যাদুঘরের পাশে ১০নং সদর স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সস্ত্রীক বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন তাঁদের সাথে সেই বাড়িতে অবস্থান করেন। তবে কবে থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও চৈত্র ১২৮৮ তে তাঁরা সেখানে ছিলেন একথা জানা যায় ঠাকুরবাড়ির ক্যাশবহির হিসাব থেকে।[৫] তবে পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১২৮৯ বঙ্গাব্দের প্রথম দুইমাস বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ পুরো এবং আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহটি সদর স্ট্রীটের ঐ ভাড়া বাড়িতে ছিলেন একথা আমাদের জানাচ্ছেন রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল।[৬] ফলে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ১২৮৯ বঙ্গাব্দের প্রথমদিকে রচিত বলে প্রশান্তকুমার পাল যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সেটি আমাদের কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। তবে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' গ্রন্থভুক্ত হওয়ার আগে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৯ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায়।[৭] পরের বছর ১২৯০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'প্রভাত সংগীত' কাব্যগ্রন্থে এ কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা অনুযায়ী 'প্রভাত সংগীতের' প্রকাশ তারিখ ১১ মে ১৮৮৩, ২৩ বৈশাখ ১২৯০ বঙ্গাব্দ।[৮] 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'কবিকাহিনী', 'রুদ্রচণ্ড', 'ভগ্নহৃদয়', 'শৈশব সংগীত' ও 'সন্ধ্যা সংগীত' গ্রন্থগুলি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনার পূর্বের অর্থাৎ প্রাক্ 'প্রভাতসংগীত' পর্বের কাব্য রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোকপাত করবো। তাহলে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার ভেতর দিয়ে কীভাবে রবীন্দ্রনাথের আত্ম-আবিষ্কারের বিষয়টি ঘটলো তা অনুধাবন করা সহজ হবে। এক্ষেত্রে আমরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হবো বেশি। কবি নিজেই তাঁর এসময়ের কবিতা এবং কাব্য রচনার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা সম্পর্কে কী বলেছেন তা জানার চেষ্টা করবো।

কলকাতা নগরের বিপুল বিত্ত বৈভব আর শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান বিখ্যাত ঠাকুর বাড়িতে শিশু রবীন্দ্রনাথ কিভাবে বেড়ে উঠেছেন, তাঁর চিন্তা চেতনার বিকাশ কিভাবে ঘটেছে পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় নানা প্রসঙ্গে তিনি বারবার বলার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর অবতরণিকায় কবি লিখেছেন–

"কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল কলের ধোঁওয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়েনি। ইমারত-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেলবেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরনার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি- বেহারার হাঁইহুই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইও হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ি দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায়

জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ– লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।

আরো একটা কারণে আমাকে ছাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুলপালানো ছেলে, পরীক্ষা দিইনি, পাস করিনি, মাস্টার আমার ভাবীকালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুলঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাঁধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।

ইতিপূর্বেই কোন একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল, ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত হত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার-ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর দশ অক্ষরের চৌকো-চৌকো কত রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে। এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে– সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হালকা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙে-চুরে তেড়ে-বেঁকে যা-হয়-একটা-কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।

শুরু হল আমার ভাঙাছাদে টুকরো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মতো; বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। এই রীতি-ভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত। এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ, আমার ভাগ্যক্রমে সেকালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য– প্রতিযোগিতার উত্তেজনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি। বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার অপ্রিয় আঘাত নামত, কিন্তু কটূক্তি ও কুৎসার উত্তেজনা তখনো সাহিত্যে ঝাঁঝিয়ে ওঠেনি।

সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সবচেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সবচেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেননি– আধো-আধো বাধো-বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণ-ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও, বিরুদ্ধ রীতির মধ্য দিয়েও, আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলাম।"[৯]

শিশু রবীন্দ্রনাথের অন্তরে কীভাবে কাব্য সরস্বতী জায়গা করে নিলেন তার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আমরা কবির উপরিউক্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখে গেলেও পরবর্তীকালে পরিণত রবীন্দ্রনাথের কাছে এ-লেখাগুলি সযত্ন ছাড়পত্র পায়নি। কুণ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ সেগুলি রচনাবলীর মধ্যে প্রকাশ করতে চাননি। তবে পরে তাদের কিছু কিছু সঞ্চয়িতায় স্থান পেলেও স্বয়ং কবির

স্বব্যাখ্যাত ভূমিকায় তিনি লিখেছেন–

"এই গ্রন্থাবলীতে আমার কাব্যরচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। তার পূর্বেও অনেক লেখা লিখেছি, কিন্তু সেগুলিকে লুপ্ত করবার চেষ্টা অনাদরে। হাতের অক্ষর পাকাবার যে খাতা ছিল বাল্যকালে সেগুলিকে যেমন অনাদরে রাখি নি, এও তেমনি। সেগুলিও ছিল যাকে বলে কপিবুক, বাইরে থেকে মডেল-লেখা নকল করবার সাধনায়। কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্‌শ করে আমরা অক্ষর ফেঁদে থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেইরকম কপিবুকের কবিতা।"[১০]

'বনফুল', 'কবি কাহিনী', 'মগ্নতরী', 'ভগ্নহৃদয়' -এর যুগ, যাকে বলা হচ্ছে প্রাক্ সন্ধ্যাসংগীত পর্ব। এই পর্বকে কবি 'কপিবুক যুগ' বলেছেন। এই অভিধা অনেকটা যৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। এরপরেই রচিত হয়েছে সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি। গীতিকবিতাই যে রবীন্দ্র-প্রতিভার আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনার পর তাঁর মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না। কবি লিখেছেন–

"সন্ধ্যাসংগীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে– গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে। তখন শক্তি অল্প, বাধা বিস্তর,– নিজের কাব্যরূপকে তখনো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভালো-মন্দ বিচার করিবার কোনো আদর্শ মনের মধ্যে ছিল না। তাহা ছাড়া, প্রথম রচনার সকলের চেয়ে মস্ত দোষ এই যে তাহার মধ্যে সত্যের অভাব থাকে। কেন-না সত্যকে মানুষ ক্রমে ক্রমে পায়– অথচ সত্যকে পাইবার পূর্বেই তাহার কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে; সেই কর্মের মধ্যে আবর্জনার ভাগই বেশি থাকে।"[১১]

কবি নিজের লেখায় পথের সন্ধান পেয়েছিলেন সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যদিয়ে। তবে তখন তার অন্তর্গত অনুভূতির স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেনি। আত্ম-অবরুদ্ধ অবস্থায় লেখা সেই কবিতাগুলি সম্পর্কে পরবর্তীকালে 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন–

"বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়ের মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কর্মহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল, তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করা হইয়াছে; কেবল সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।"[১২]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন–

"আমি যখন সাহাজাদপুরে ছিলাম তখন একটি গভীর আত্মচেতনার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছিলাম, 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতাগুলির মধ্যে আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, আমি যেন আমাকে পেয়ে আমাকে জেনে বেঁচে গেলাম। এর আগে আমি কি ছিলাম জানি না, হয়তো বিহারী চক্রবর্তী বা আর কিছু ছিলাম। কিন্তু এই সময় থেকে আমার রচনার মধ্যে স্বতঃস্ফুরণ হতে লাগল, সৃষ্টির আনন্দে আমার মন ভরে গেল।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ অন্যের অনুকরণের হাত থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু এ সময়ের রচনার মধ্যে তাঁর মানসমুক্তি সেভাবে ঘটলো না। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী রচনার সাথে সন্ধ্যাসংগীতের বহিরাবরণের পার্থক্য ঘটেছে, কিন্তু

অন্তরের ভাবগত যোগসূত্র রয়ে গেছে। শৈশব থেকে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে কবির একটা সহজ স্বাভাবিক যোগ ছিল। কিন্তু শৈশবোত্তর প্রথম যৌবনে হৃদয়াবেগ বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই স্বাভাবিক সম্পর্কের ছেদ ঘটেছিল। সেই তরল আবেগ অনেকটা বায়বীয় উচ্ছ্বাসমাত্র। এই উচ্ছ্বাস কবির প্রকৃত রসানুভূতির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। অসম্ভব অবাস্তব কল্পনা মনের মধ্যে কোন স্থিরতা আনে না। চিত্তকে সংহত করা খুব দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বাইরের বিস্তীর্ণ বাস্তব জগত তখন ক্রমশ দূরে সরে যায়। তার সঙ্গে অন্তরের মিল থাকে না। এই বস্তুহীন কল্পনা ও কারণহীন আবেগের কারাগারে কবির মন অবরুদ্ধ হয়েছিল।[১৪] কবি এই অবরুদ্ধ সময়ে লিখেছিলেন সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি। গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্যে ভরা হৃদয়ে লেখা এই কবিতাগুলির মূলসুর ছিল বেদনায় সিক্ত। কবি নিজেই সন্ধ্যাসংগীতের মূলভাব সম্বন্ধে লিখেছেন–

"মানুষের মধ্যে অবস্থা-বিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। ...মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে অন্তরের সুর যখন মেলে না– সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না, তখন সেই অন্তর-নিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস-প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না–ইহার বর্ণনা নাই-এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে–তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে, তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে, সেখানে জীবন কোনোমতে পৌঁছাতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনো মতে জাগিয়া উঠিতে চায়– ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে– অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাস অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে।"[১৫]

১৩২১ সনে প্রকাশিত মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীতে সন্ধ্যাসংগীতের এই শ্রেণির দুঃখ ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক কবিতাগুলোকে নাম দিয়েছিলেন 'হৃদয় অরণ্য'। এই কবিতাগুচ্ছের ভূমিকা হিসেবে কবি নিজেই একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। তার প্রথম লাইনটি ছিল 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।'

অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ এই লাইনটি। এসময়ে কবি নিজের হৃদয়ের গভীরে অবরুদ্ধ থেকে যে বেদনা অনুভব করেছেন শুধু তাই বলেন নি। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এর ভেতর দিয়ে পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের অক্ষমতার বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রস্ফুটিত ফুলের সৌগন্ধ মানুষ, প্রকৃতি সবাইকে বিমুগ্ধ করে। কিন্তু সে ফুল সম্পূর্ণ ফুটে ওঠেনি। এখনো কুঁড়ি হয়ে আছে তার মধ্যে সেই গন্ধ গুমরে মরছে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, আলোর জন্যে কাতর প্রার্থনা। মুক্তির এষণা মুহুর্মুহু। কুঁড়ির ভেতরে যেমন অপ্রকাশিত গন্ধ ক্রন্দন করছে, কবির অন্তরের মধ্যে বেদনার অপার রহস্যের জাল তেমনি ক্রমশ বিস্তারিত হচ্ছে। কিন্তু বের হওয়ার পথ পাচ্ছে না। এই অপ্রকাশের ভার তাঁকে আরো অতৃপ্তি ও অশান্ত করে তুলছে। বাইরে প্রকৃতির অজস্র রূপ আপন মহিমায় প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে উদ্ভাসিত হচ্ছে। জগতের প্রতি কোণে কোণে উদ্দাম আনন্দরাশি খেলা করছে। কবি তাদের দিকে কাঙালের মতো চেয়ে আছেন, কিন্তু অবরুদ্ধ হৃদয়ের

ভেতর থেকে সাড়া পাচ্ছেন না। এই অতৃপ্তি আকাঙ্ক্ষার আগুন তাঁকে পোড়াচ্ছে।

কবির এই মানস সংকটকালে তিনি 'সন্ধ্যাসংগীতের' কবিতা রচনার পরে 'প্রভাত সংগীত' এর কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন। সন্ধ্যার পর রাত ক্রমশ গভীর হয়। অন্ধকার তার আপন মসীমাখা রূপ ক্রমশ ঘনীভূত করে। অর্থাৎ রাত যত গভীর হয় প্রভাত ততই এগিয়ে আসে। কবি নতুন সকালের আলোয় স্নাত হতে চাইছেন। কিন্তু তখনও উষাকালের পাতলা অন্ধকার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। সে কারণে 'প্রভাতসংগীতে'র প্রথমদিকের কবিতার মধ্যে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র সেই অবরুদ্ধ যন্ত্রণার ছাপ আছে। 'প্রভাত সংগীত' কাব্যের প্রথম কবিতা 'আহ্বান সংগীত' কবিতার শুরুতে সেই বেদনাবোধেরই প্রকাশ ঘটেছে–

" জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খসে–
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস বসে।
মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা।
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস
হাহুতাশ করে সারা,
কোণে বসে শুধু ফেলিস নিশাস,
ঢালিস বিষের ধারা।"[১৬]

কবি তাঁর স্বরচিত কারার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ক্রমাগত নিজের জালে আটকে যাচ্ছেন। কিন্তু এই কবিতার পরবর্তী অংশে আমরা দেখতে পাই তিনি বাইরের একটা আহ্বান ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন–

"দেখ রে সবাই চলেছে বাহিরে
সবাই চলিয়া যায়,
পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
শোন রে কী গান গায়।
জগৎ ব্যাপিয়া শোন্ রে সবাই
ডাকিতেছে, আয়, আয়–
কেহ বা আগেতে কেহ বা পিছায়ে,
কেহ ডাক শুনে ধায়।"[১৭]

সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে তাঁর এতদিনের অবরুদ্ধ প্রাণকে তিনি উদ্বুদ্ধ করছেন। সুদীর্ঘ রাতের

অন্ধকার ভেদ করে নতুন সকালের ডাকে সবাইকে বাহিরে আসতে বলছেন। চারিদিকে প্রাণের সঞ্চার তিনি অনুভব করছেন–

"অসীম আকাশে স্বাধীন পরানে
প্রাণের আবেগে ছোটে,
এ শোভা দেখিলে জড়ের শরীরে
পরান নাচিয়া ওঠে।
তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস!
....
আর কতদিন কাটিবে এমন,
সময় যে চলে যায়।
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই,
বাহির হইয়া আয়!"[১৮]

এরপর হঠাৎ একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। কবির হৃদয়ের এতদিনের অন্ধকারাগার ভেঙে তিনি মুক্ত হয়ে নতুন পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন। সহসাই ঘটে গেল সেই পরিবর্তন। এই বিরাট পরিবর্তনের কথা তিনি নিজেই লিখেছেন তাঁর জীবন স্মৃতিতে–

"আমার মনে আছে, জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমত দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয়, সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম– কিছুমাত্র কৃতকার্য হই নাই, তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-ইস্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। সেইদিনই কিংবা তাহার পরের দিন একটা ঘটনা ঘটিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য বোধ করিলাম। একটি লোক ছিল সে মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, "আচ্ছা মশায়, আপনি কি ঈশ্বরকে কখনো স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।" আমাকে স্বীকার করিতেই হইত, দেখি নাই– তখন সে বলিত, "আমি দেখিয়াছি।" যদি জিজ্ঞাসা করিতাম "কিরূপ দেখিয়াছ" সে উত্তর করিত, চোখের সম্মুখে বিজবিজ করিতে থাকেন। এরূপ মানুষের সঙ্গে তত্ত্বালোচনায় কালযাপন সকল সময়ে প্রীতিকর হইতে পারে না। বিশেষত, তখন আমি প্রায় লেখার ঝোঁকে থাকিতাম। কিন্তু লোকটা ভালো মানুষ ছিল বলিয়া তাহাকে বাধা দিতে পারতাম না, সমস্ত সহিয়া যাইতাম।

এইবার, মধ্যাহ্নকালে সেই লোকটি যখন আসিল তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, "এসো এসো।" সে যে নির্বোধ এবং অদ্ভুতরকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিরাবরণটি যেন খুলিয়া গেছে। আমি যাহাকে দেখিয়া খুশি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম সে তাহার ভিতরকার লোক– আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে। যখন তাহাকে দেখিয়া আমার কোনো পীড়া বোধ হইল না, মনে হইল না যে আমার সময় নষ্ট হইবে, তখন আমার ভারি আনন্দ হইল– বোধ হইল, এই আমার মিথ্যাজাল কাটিয়া গেল, এতদিনে এই সম্বন্ধে নিজেকে বার বার যে কষ্ট দিয়াছি তাহা অলীক এবং অনাবশ্যক।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেউ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর-এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না– বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।"[১৯]

কবির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহির্জগতের এক দিব্যরূপ দেখলেন। তখন তাঁর চোখের উপর থেকে অন্ধকারের পর্দাটাই শুধু সরে গেল না, 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনাকালে কবি হৃদয়-অরণ্যের যে পথ হারিয়েছিলেন সেই হারানো পথের সন্ধান পেলেন। এতকাল কবি যে বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয়ে দুঃখের গান গাইছিলেন এবারে তার অবসান হলো। সন্ধ্যার পর গভীর রাত পেরিয়ে যেন প্রভাতের আবির্ভাব। সেদিনের সেই প্রভাতবেলা কবির জীবনে যে নতুন বার্তা নিয়ে এসেছিল তা সারাজীবন কবিতে তাড়িত করেছে। প্রতিদিন নিয়ম মতো সূর্যোদয় ঘটেছে, কিন্তু ঐদিনের সূর্যোদয়ে আলোকরাশি এতদিন যেখানে প্রবেশ করেনি অথবা করতে পারেনি, আজ সেই প্রাণের গভীরে প্রবেশ করেছে–

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।[২০]

ছোট্ট একটা ঝর্ণা গিরিগুহায় আবদ্ধ ছিল। তার চারপাশে পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা। হিমানী তার গতিবেগ রুদ্ধ করে রেখেছে। বৈচিত্র্যহীন, বিকাশহীন অবরুদ্ধ জীবনে তার চলার ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিল। প্রতিদিন প্রভাতের আহ্বানে প্রকৃতি ঝলমল করে, পাখির কাকলিতে চারদিক মুখরিত হয়। কিন্তু তার অবরুদ্ধ কারাগারে সেই আনন্দবার্তা পৌঁছায় না। পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে তার জন্ম থেকেই অবস্থান। সেখান থেকে সে মুক্তির পথ খোঁজে অথচ সন্ধান পায় না। হঠাৎ একদিন সকল রহস্য উন্মোচন করে সেই অন্ধকার গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করলো নবোদিত সূর্যের আলো ও প্রভাত পাখির গান। বহুকাল ধরে রুদ্ধ নির্ঝরিণীর অসাড় প্রাণে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। বিপুল আবেগ ও আনন্দ তার বুকের মধ্যে ঢেউ তুললো–

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।[২১]

এখন সে বুঝতে পারছে তার চারপাশের কঠিন শিলা অপসারণ করতে না পারলে তার মুক্তি নেই। এই যে বহুকালের বন্ধন একে ছিন্ন করে, চূর্ণ করে বাহিরে বেরিয়ে পড়তে হবে। তাই তার মুখে তখন ভাঙনের বাণী–

কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর![২২]

অন্ধকার পাষাণ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ঝর্ণা সারাবিশ্বে প্রবাহিত হতে যাচ্ছে। এতকাল সে অচল হয়ে পড়েছিল ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে। তার সেই ক্ষুদ্র জীবন আজ বৃহৎ জীবনের সাথে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে। ক্ষুদ্র প্রাণে সে আজ অফুরন্ত প্রাণ অনুভব করছে। মুক্তির আনন্দে সে আজ উদবেলিত–

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,

ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে– প্রাণ হয়ে আছে ভোর ॥[২৩]

এই ক্ষুদ্র অবরুদ্ধ নির্ঝরিণী আর কিছু না, এ কবির এতকালের রুদ্ধ হৃদয়। পাষাণ প্রাচীরে এতকাল ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীটি রুদ্ধ হয়েছিল। কবির হৃদয় তেমনি যৌবনের প্রারম্ভিককাল থেকেই অবরুদ্ধ হয়েছিল। শৈশবে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে কবির যে স্বাভাবিক এবং সহজ সম্পর্ক ছিল, যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয়াবেগ বৃদ্ধির সাথে সাথে সে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কবি তখন একান্তই হৃদয়াবেগের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এসময়ে বাইরের বিস্তীর্ণ বাস্তব সংসারের সাথে কবির তেমন কোন সংযোগ ঘটছিল না। কারণ তাঁর অন্তরের বায়বীয় উচ্ছ্বাসপূর্ণ আবেগের সাথে তার মিল ছিল না। এই বস্তুহীন কল্পনা ও কারণহীন আবেগের কারাগারে কবির মন অবরুদ্ধ হয়েছিল।[২৪] এই রুদ্ধজীবনের অনুভূতির সঙ্গে বাস্তবের মিল না হওয়ায় ঐ ছায়ারাজ্যে কোন তৃপ্তির সন্ধান পাচ্ছিলেন না কবি। গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্যে তাঁর হৃদয় ভরে গিয়েছিল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার ছোট নির্ঝরিণীর মতো কবির হৃদয়ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কাতর হয়ে পড়েছিল। বাইরের আলো-বাতাস, প্রভাত পাখির গান রুদ্ধ পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে যেমন প্রবেশ করতে পারছিলো না, তেমনি কবির হৃদয়ের মধ্যে বাইরের বাস্তব সংসারের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের সংযোগ ঘটছিলো না। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তিনি নিজের হৃদয়ের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছেন। অবশেষে একদিন তাঁর প্রাণের উপর সকল অন্ধকার ভেদ করে নতুন আলোকচ্ছটা এসে পড়লো। কবি বলেছেন–

"এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাঁহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন-একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে– এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে।"[২৫]

কবি নবজীবনের গভীর আস্বাদ উপভোগ করলেন। আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দে বিমুগ্ধ হলেন তিনি। সেদিনের সকালের বারান্দায় দাঁড়াইয়া জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে দিব্যরূপ দর্শন করেছিলেন। এই অনুভূতির কথা তিনি বহুকাল পরে 'মানুষের ধর্ম' আলোচনা প্রসঙ্গেও উচ্চারণ করেছিলেন–

"সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের মাথাটা দেখা যেত। সে দিকে চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হল মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে

চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না, তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।"[২৬]

যৌবনের প্রারম্ভে কবির হৃদয়ে এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশের অন্য একটি কারণ ছিল। সে কারণটির কথা কবি নিজেই বলেছেন এই প্রবন্ধের মধ্যে– "বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার বার আবৃত্তি-দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব-কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না; বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্বিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃস্বঃ– এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।"[২৭]

কবির প্রথম যৌবনের সেই জ্যোতির্ময় প্রভাতে যে দিব্যবাণী তিনি লাভ করেছিলেন, যার ফলে চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহির ও অন্তর সমস্তর সমন্বয়ে এক অখণ্ড সচল সমগ্রতাকে তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই-ই রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার জগৎ, রবীন্দ্রনাথের কবি জগৎ।[২৮] 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় এর সূচনা। কবি নিজেই বলেছেন– "আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিলাম। ---- একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।[২৯] অভিজ্ঞতার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর সাথে ধ্বনি ও ইন্দ্রিয়ের জগৎ মিলিত হয়ে ক্রমে সাধনায় সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু সেদিনের সেই সূর্যোদয়ের জ্যোতির্ময় প্রভাত তাঁকে বলে দিয়েছে যে জগতের জ্যোতির্ময় রূপটিই সত্য। এই অভিজ্ঞতাই জীবনের পরিণতির সাথে বিকশিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সবিতৃ-বাদে পৌঁছিয়াছে। খণ্ড সৌন্দর্য ও বিশ্বসৌন্দর্যবোধ এবং সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব-মিলনের প্রকাশ রবীন্দ্র কাব্য চেতনায় যে ঘটেছে তারও সূচনা এই প্রভাতবেলার আমন্ত্রণে। তাই বলা যেতে পারে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনার সেই অভিজ্ঞতা যদি রবীন্দ্রনাথের জীবনে না ঘটতো তাহলে তিনি হয়তো মহৎ কবি হতে পারতেন, কিন্তু দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন কবি হতে পারতেন কি-না সে সন্দেহ থেকেই যায়। এই দিব্যদৃষ্টির মধ্য দিয়ে কবির বিশ্ববোধ জাগ্রত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের প্রথম বাতায়ন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের সেই অভিজ্ঞতায় খুলে গিয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা , ১৩৯৩, পৃ. ৩৩

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী-১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৯২, পৃ. ১৬৩-১৬৪

৩. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী-২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১৪৭

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী-৯ম খণ্ড, জয়বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা, ১৪০৬, পৃ. ৪৯২

৫. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭

১০. পূর্বোক্ত, সন্ধ্যাসংগীত কাব্যগ্রন্থের সূচনা অংশ

১১. ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্র কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ২৫

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৫

১৩. ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১৯. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৯২

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, প্রতীক প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৬

২১. পূর্বোক্ত

২২. পূর্বোক্ত

২৩. পূর্বোক্ত

২৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৪

২৬. পূর্বোক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৪

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৩

২৮. প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৯৬, পৃ. ২৮

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২